বিশেষ স্মরণিকা

ডঃ কুমুদ রঞ্জন নস্কর
এক তন্নিষ্ঠ সুন্দরবন গবেষক

চলে গেলেন 'স্বাস্থ্য, শিক্ষা, উন্নয়নে'র পৃষ্ঠপোষক, নিয়মিত লেখক, বিশিষ্ট উদ্ভিদ বিজ্ঞানী ডঃ কুমুদ রঞ্জন নস্কর। সুন্দরবনের সঙ্গে তাঁর নাম প্রায় সমার্থক হয়ে গেছিল। সুন্দরবন নিয়ে কেউ কিছু জানতে চাইলে কি পশ্চিমবঙ্গে বা ভারতের অন্যত্র তাঁর শরণাপন্ন হতে হোত। সুন্দরবনকে তিনি প্রচণ্ড ভালবাসতেন। জীবনের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ সময় তিনি সুন্দরবনের উপর গবেষণা করে কাটিয়েছেন। সুন্দরবন নিয়ে তাঁর এই তন্নিষ্ঠ গবেষণা দৃষ্টি আকর্ষণ করত। কর্মসূত্রে তিনি ছিলেন কেন্দ্রীয় অন্তর্দেশীয় মৎস্য গবেষণাকেন্দ্রের (সি.আই.এফ.আর.সি.) প্রধান বিজ্ঞানী। পাশাপাশি দু'বারের (একেকটি পাঁচ বছরের কার্যকালের) জাতীয় গবেষক। সুন্দরবনের উদ্ভিদ, জীব, বাস্তুতন্ত্রের সংরক্ষণ ছিল তাঁর গবেষণার মূল বিষয়বস্তু এবং সুন্দরবন রক্ষার সঙ্কল্প নিয়ে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মেলা বিভিন্ন মঞ্চে জনপ্রিয় বক্তৃতা ও আলোচনা চালিয়ে গেছেন বছরের পর বছর। তিনি ছিলেন নিরলস ও নিরহঙ্কারী এক কর্মবীর যাঁর সৌজন্য ও আন্তরিকতা তাঁর সহকর্মী, সহগবেষক, ছাত্র সকলের হৃদয় ছুঁয়ে যেত। সুন্দরবন-প্রাণ কর্মচঞ্চল এই মানুষটি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান।

দক্ষিণ চব্বিশপরগণার এক প্রত্যন্ত গ্রামের এক সাধারণ পরিবারে কুমুদবাবুর জন্ম। বাবা ছিলেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। কলকাতার সিটি কলেজ থেকে উদ্ভিদবিদ্যায় অনার্স নিয়ে স্নাতক হয়ে প্রবল অর্থাভাব সত্ত্বেও খুব কষ্ট করে বালিগঞ্জ সায়েন্স কলেজ থেকে স্নাতকোত্তর হন। বিশাল অভাবী সংসারের ভরনপোষণের জন্য সেই সময় পাশাপাশি তাঁকে সরকারি বিদ্যালয়ে পড়ানোর কাজ নিতে হয়। এরপর তিনি বোটানিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার গবেষক হিসাবে কাজ শুরু করেন, তারপর সর্বভারতীয় পরীক্ষা দিয়ে I.C.A.R.-র অধীনে CIFRC-তে যোগ দেন। ইতিমধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি.এইচ.ডি. করেন। তাঁর বিষয় ছিল "Floristic Survey of the district 24 Paraganas in West Bengal (India) with special reference to the Mangrove Vegetation of the Sundarban."। তিনি মনে করতেন সুন্দরবন না বাঁচলে দক্ষিণবঙ্গ বাঁচবে না, তাই গবেষণার পাশাপাশি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক সংগঠনের সাথে আমৃত্যু সুন্দরবন সংরক্ষণের কাজ করে গেছেন। তিনি ছিলেন প্রচার বিমুখ। তাঁর হাতে বহু গবেষক তৈরী হয়েছে, তিনি ১৪টি মৌলিক গ্রন্থ লিখে গেছেন। বাজারি পত্রিকায় তাঁর নাম শোনা যেত না, কিন্তু তাঁর প্রতিটি কাজ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ মহলে সম্ভ্রম আদায় করেছে। তিনি নিয়মিত সোনাগাঁ সহ সুন্দরবনের অভাবতাড়িত গ্রামগুলিতে যেতেন এবং সেখানে আর্থিক অনুদান, বস্ত্র, পুস্তক প্রভৃতি প্রদানের পাশাপাশি ম্যানগ্রোভ সংরক্ষণ ও বিস্তার এবং বিকল্প অর্থনীতি সৃষ্টির প্রয়াস নিয়েছিলেন। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের ভেষজ উদ্যান গঠন এবং সারগাছি, মুর্শিদাবাদ, কেন্দ্রে সমাজসেবায় তাঁর বিশিষ্ট অবদান ছিল। তাঁর প্রয়াণে সমাজ একজন যথার্থ সমাজসেবীকে হারালো, সুন্দরবন হারালো তাঁর প্রিয় স্বজনকে।

ডঃ অভি দত্ত মজুমদার
প্রতিভাবান গণবিজ্ঞান সংগঠক

এই সংখ্যায় মার্কিন-ভারত পরমাণু চুক্তি ও তার গভীর তাৎপর্য নিয়ে অভির লেখার কথা ছিল, অথচ দুর্ভাগ্য তাঁর স্মরণিকা লিখতে হচ্ছে। বামফ্রন্ট শাসনের শেষ দিক। **সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম, নেতাই**– একটির পর একটি রাষ্ট্রীয় দমন পীড়ন। প্রতিবাদে উত্তাল রাজপথ। সেই রাজপথে যে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী নেমে এসে সমাজ পরিবর্তনের জন্য মিছিলে হেঁটেছিলেন আবার একচেটিয়া আগ্রাসন, 'এস.ই.জেড.', 'পরমাণু চুক্তি' প্রভৃতির কুফল সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করেছিলেন, পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাবিদ-বিজ্ঞানী-বুদ্ধিজীবীদের দিশা দেখাচ্ছিলেন গণবিজ্ঞান ও পরিবেশ আন্দোলনের পথ ও পদ্ধতি নিয়ে তিনিই ডঃ অভি দত্ত মজুমদার।

ময়মনসিংহের স্বাধীনতা সংগ্রামী পরিবার যারা দেশভাগের ঘূর্ণাবর্তে হুগলীর ধনেখালিতে বসতি করেন, সেখানে অভির জন্ম ও বেড়ে ওঠা। মেধাবী ছাত্র হিসাবে অভি **'সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স (এস.আই.এন.পি.)'** থেকে পি.এইচ.ডি. করেন। তারপর কানাডায় পোস্ট-ডক্টরেট করে এস.আই.এন.পি.-তে ফিরে এসে 'হাই এনার্জি ফিজিক্স ডিভিশনে' গবেষণা ও অধ্যাপনা শুরু করেন। এর পাশাপাশি শুরু সমাজ সেবার কাজ, সমাজ পরিবর্তনের সংগ্রাম। তৈরী হয় **এফ.এ.এম.এ. (FAMA)** সহ একাধিক সংগঠন, শুরু হয় একচেটিয়া আগ্রাসন, এস.ই.জেড., রাসায়নিক হাব, পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র, জি.এম. বীজ ও খাদ্য, এফ.ডি.আই. প্রভৃতির বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম। এই পর্যায়ে অভি নিরলসভাবে ঘুরে ঘুরে, আলোচনা ও তর্ক করে, বক্তৃতা দিয়ে, লেখালেখি করে জনমত সংগঠিত করছিলেন। কিন্তু অল্পবয়সে কর্কট রোগের থাবা তাঁর অতিমূল্যবান প্রাণটি অকালে ছিনিয়ে নেওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের গণতান্ত্রিক, নাগরিক, বিজ্ঞান ও পরিবেশ আন্দোলন ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ডাঃ অমল রায় চৌধুরী
জনদরদী অজাতশত্রু স্বাস্থ্য প্রশাসক

শ্বাসকষ্টজনিত রোগে দীর্ঘ ভোগের পর অমলদা চলে গেলেন। কে তাহলে খুঁটিয়ে লেখাগুলি পড়ে একটি দুটি কথায় মতামত জানাবেন? বিভিন্ন সমস্যায় পড়া মানুষজনের কথা ধৈর্য্য ধরে শুনে কেই বা এগিয়ে দেবেন সহযোগিতার হাত? বামফ্রন্ট তখন ক্ষমতার মধ্যগগনে, সিপিআইএম দলের তখন দোর্দণ্ড প্রতাপ। অনিলায়ন বা রেজিমেন্টেশন্ যাই বলুন না কেন তার ভারে আকাশ বাতাস থরহরি কম্প। দলীয় নির্দেশের এতটুকু এদিক

ওদিক হওয়ার জো নেই। পার্টির একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য, মেডিকেল ফ্রন্টের পদাধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর মধ্যে কোন অহঙ্কার, কর্তৃত্ববাদ, চারিত্রিক বিচ্যুতি, অনীতিনিষ্ঠা বা সুযোগ সন্ধান কারো চোখে পড়েনি। একইভাবে সবাইকে নিয়ে কাটিয়ে দিলেন সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবন। রক্তচক্ষুর ভুক্তভোগী মানুষজন, বিরোধী ধারার মতাবলম্বী সবাই আশ্রয় পেয়েছেন তাঁর দরাজ বুকে, লাভ করেছেন নিরপেক্ষ বিচার। তাঁর বহরমপুর, জলপাইগুড়ি ও স্বাস্থ্যভবনের অফিসে এবং বহরমপুরের গৃহে কিংবা লবন হ্রদের কোয়ার্টারে জেলা ও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কত না মানুষ কত সমস্যা নিয়ে আসতেন।

মুর্শিদাবাদের ভিয়েতনাম নবগ্রামের এক বামপন্থী পরিবারে জন্ম। বাবা ছিলেন শিক্ষক আন্দোলনের সাথে যুক্ত, মামা বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা কমলাপতি রায়। সমাজতান্ত্রিক পরিবেশে কমিউনিস্ট আন্দোলনের মধ্যে বেড়ে ওঠা, তাই আমৃত্যু ছিলেন সাহসী, অবিচল ও নীতিনিষ্ঠ। বহরমপুরে পড়ার শেষে কলকাতার নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় জমানায় কলেজে বাম রাজনীতি করতে গিয়ে বারংবার আক্রান্ত ও রক্তাক্ত হন। বিভিন্ন গণ আন্দোলন ও রিলিফ আন্দোলনের সাথে সক্রিয় ছিলেন। পরে সরকারি চিকিৎসা পরিষেবায় যোগ দেন এবং উপমুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক, মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক, সহস্বাস্থ্য অধিকর্তা বিভিন্ন দায়িত্ব সামলান। ছিলেন PRC, Students Health Home, IMA, AHSD বিভিন্ন সংগঠনের দায়িত্বে। দুর্নীতি, সুবিধাবাদ ও ভোগবাদের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। ছিলেন একনিষ্ঠ পাঠক ও শ্রোতা এবং তাঁর মজার ছড়া লেখার হাত ছিল। তাঁর অকাল প্রয়াণে আমরা অভিভাবকহারা হলাম।

'বালেশ্বর যুদ্ধ' – শতবর্ষে ফিরে দেখা

– দেবাশিস মুখোপাধ্যায়

১৯১৫-র ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহ, পাঁচ বাঙালি যুবক অতি সন্তর্পণে বালেশ্বরের জঙ্গল পথে এগিয়ে চলেছে দেশমাতৃকার মুক্তিকল্পে আত্মবলিদানের উপযুক্ত যজ্ঞবেদীর সন্ধানে। কপ্তিপদা থেকে বার হবার পর গত তিনদিন ধরে তাদের না জুটেছে খাদ্য, না জুটেছে বিশ্রাম। তাদের পা যেন আর চলেনা। সামান্য কিছু পেটে না দিলে আর বুঝি এগোন যায় না। তাদের শিকারী কুকুরের মতো খুঁজে বেড়াচ্ছে ব্রিটিশ ফৌজ। তাদের সাথে কেবল পদাতিক সৈন্য নয়, জঙ্গলের পথে চলার জন্য আছে প্রশিক্ষিত হাতিও। সামনেই একটা গ্রাম পড়তেই তারা একটি দোকানে গিয়ে খাবারের খোঁজ করল। পেয়েও গেল, কিন্তু দাম দিতে গিয়ে হল বিপত্তি। খুচরো না থাকায় তারা দিয়েছিল দশ টাকার একটা নোট। সেকালের দশ টাকা। অনেক অনেক টাকা। চমকে উঠলো দোকানী। চেঁচিয়ে উঠল সে ডাকাত ডাকাত বলে। সারা গ্রামের লোক জড়ো হয়ে গেল সেখানে। সকলেরই কৌতুহল তাদের ঘিরে। কারণ তারা শুনেছে সরকারী ঘোষণা। পাঁচজন খুনে, ডাকাতির উদ্দেশ্যে এই অঞ্চলে ঢুকেছে। তারা সবাই জর্মানের চর। এদের ধরিয়ে দিতে পারলেই বিরাট পুরস্কার। দেশ সেবার, সমাজ সেবার বিরাট কার্যকলাপের সঙ্গে যারা ছিল অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত তারা আজ ডাকাতির অভিযোগে অভিযুক্ত। এই পাঁচ বিপ্লবী হলেন **দাদা - যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘাযতীন), চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী, মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত, নীরেন দাসগুপ্ত ও যতীশ পাল**। বিধাতার কি বিচিত্র অভিপ্রায়। আর কয়েক ঘণ্টা বাদে যারা দধিচীর মতো নিজেদের অস্থি দিয়ে বজ্র নির্মাণ করে তা দিয়ে যাবে আগামীকালকে, দেশমাতৃকার দাসত্ব শৃঙ্খল মোচনের জন্য তারা সেদিন চরম লাঞ্ছিত, অপমানিত নিজের দেশের মানুষের কাছেই। কিন্তু এতো সব পরের কথা। আগের কথা আগে হোক। না সে বাঘাযতীনের দু-দুবার কেবল ছোরা হাতে বাঘ মারার গল্প নয়, বা অপমানের জবাবে রেলস্টেশনে এক এক ঘুসিতে তিনজন গোরা মিলিটারিকে ধরাশায়ী করা বা রেলের কামরার ওপরের বাঙ্ক থেকে তিনজন মস্ত কাবুলিওয়ালাকে মেয়েদের সাথে খারাপ ব্যবহার করার জন্য টেনে নামিয়ে আনার অতি বলপ্রকাশের গল্প নয়। সেসব তো বাঙালির কিংবদন্তী। আগের কথা, বাঘাযতীনের হাতে সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতির কথা।

১৯০৮ সাল। সারা বাংলাদেশ জুড়ে তখন সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাসী নানান দল, উপদল। যাদের মধ্যে অন্যতম বাংলার বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন **অনুশীলন সমিতি। স্বদেশ বান্ধব সমিতি, দরিদ্র ভাণ্ডার, অনাথ আশ্রম, বান্ধব কোম্পানি, সুহৃৎ সমিতি, সাধনা সমাজ, আত্মোন্নতি সমিতি, ব্রতী সঙ্ঘ** — এদের আবার নানা উপদল। কলিকাতায় **যতীন মুখার্জীর** দল, **হরিশা শিকদারের** দল, ময়মনসিংহের **হেমেন্দ্র কুমার আচার্য চৌধুরীর** দল, **বিজয় রায়ের** যশোর-খুলনার দল, **শ্রীশ ঘোষের** চন্দন নগরের দল, **সতীশ সেনগুপ্ত ও আশুতোষ দাসের** শ্রীরামপুরের দল, **নিবারণ ঘটকের** বাঁকুড়া দল এবং **পূর্ণচন্দ্র দাসের** মাদারিপুর দল প্রভৃতিরা ছিল সে সময় অত্যন্ত প্রভাবশালী। এদের কাজ বাহ্যিকভাবে বন্যা-খরা-মহামারিতে দেশের মানুষের স্বার্থে ত্রাণকার্য পরিচালনা; বিদ্যালয়, কলেজ প্রতিষ্ঠা করে দেশের মানুষকে শিক্ষাদান কিংবা বিভিন্ন কুটির শিল্পে স্ব-রোজগারের ব্যবস্থা করা কিন্তু আন্তরিকভাবে তাদের কাজ ছিল ইংরেজ সরকারের অন্যায়ের সক্রিয় প্রতিবাদ এমন কি প্রয়োজনে গুপ্ত হত্যা করে ইংরেজ এবং তাদের দ্বারা পুষ্ট ভারতীয়দের মনে ভীতির সঞ্চার করা। কিন্তু দলগুলির মধ্যে একতা না থাকায় এবং নিজেদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিযোগিতা থাকায়,

ডা: দারকানাথ কোটনিস

— দীপাঞ্জন রায়

ডাঃ দ্বারকানাথ শান্তারাম কোটনিস ৪ অক্টোবর ১৯১০, দক্ষিণ মহারাষ্ট্রের সোলাপুরে এক নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ২ ভাই আর ৩ বোনের মধ্যে বড় হওয়া কোটনিস মহারাষ্ট্রের জি এস মেডিক্যাল কলেজ থেকে ডাক্তারি পাশ করেন। অবশ্য এইসব তথ্যাবলীর মধ্যে ডাঃ কোটনিসকে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

ডাঃ কোটনিসের সন্ধান পেতে গেলে আমাদের পিছিয়ে যেতে হবে ১৯৩৭ সালে এই বছর আগ্রাসী জাপ বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধরত চীনা কমিউনিস্ট পার্টির লাল সৈন্যবাহিনীর জেনারেল Zhu Dhe ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কাছে ডাক্তার পাঠানোর জন্য আবেদন করেন। এই আবেদন ছিল একটি পরাধীন যুদ্ধরত জাতির আরেক পরাধীন স্বাধীনতাকামী জাতির কাছে সাহায্য আর সহমর্মিতার আবেদন। ভারতও সাড়া দিতে দেরি করেনি। তদানীন্তন জাতীয় কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসুর উদ্যোগে সংগৃহীত ২২ হাজার টাকা আর ৫ জন ভারতীয় ডাক্তার সঙ্গে নিয়ে ১৯৩৮ সালে Indian Medical Mission চীনে পৌঁছায়। টীমে ছিলেন ডাঃ এম অটল, এম চোলকর, বি. কে. বাসু, ডি. মুখার্জী আর ২৪ বছর বয়সী ডাঃ কোটনিস। মিশন শেষ করে টিমের সব সদস্যই ভারতবর্ষে ফিরে আসেন। একমাত্র ফিরে এলেন না ডাঃ কোটনিস।

কারণ এরমধ্যে কোটনিস ভালোবেসে ফেলেছেন চীনের সংগ্রামী জনতা আর তাদের অনমনীয় সংগ্রামকে। এক পরাধীন দেশ থেকে আসা ডাঃ কোটনিসের কাছে আরেক পরাধীন জাতির চীনের এই সংগ্রাম, যা শুধুমাত্র জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত নয়, বরং সমস্ত রকম শোষণ, বঞ্চনা আর অন্যায়ের অবসানের উদ্দেশ্যে চালিত, তা এক অন্য মাত্রা নিয়ে দেখা দিয়েছিল। তিনি ঠিক করে ফেলেছিলেন নিজের জীবনের উদ্দেশ্যকেও এবং তা হল চীনের এই সংগ্রামের সহযোগী হয়ে ওঠা। ডাঃ কোটনিসের পরবর্তী জীবনকাল খুবই সংক্ষিপ্ত, অন্তত সংখ্যার হিসেবে। তবু ইতিহাস সাক্ষী এই স্বল্প সময়ের মধ্যে তিনি তার জীবনের উদ্দেশ্য পালনে ছিলেন নিরলস প্রয়াসী।

আর সেই প্রয়াসে ডাঃ কোটনিস ছুটে গেছেন চীনের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে। কখনো Dr. Bethune International Peace Hospital-এর ডিরেক্টর হিসেবে, কখনো Dr. Bethune Hygiene School-এর লেকচারার হিসেবে, কখনো কোনও আহত সৈনিকের বিছানার পাশে ডাঃ কোটনিস তাঁর দায়িত্ব পালন করে গেছেন। অবশেষে ১৯৩৯ সালে Ji-Chai-Ji সীমান্তের Wutai পাহাড়ের কাছে তিনি যোগ দিলেন বিখ্যাত অষ্টম রুট আর্মিতে — সেই বাহিনীর নেতৃত্বে যিনি তাঁর নাম — মাও সে তুং।

এরপর ডাঃ কোটনিসের সৈনিকের জীবন শুরু হল। যে জীবন সবচেয়ে কঠিন, সবচেয়ে পরিশ্রমসাধ্য, আর সবচেয়ে মহান। ডাঃ নরম্যান বেথুনের জীবনী থেকে আমরা যে জীবনের আভাস পাই। শত্রু সৈন্যের কাছ থেকে যে কোনও মুহূর্তে আক্রমণের আশঙ্কা, প্রতিকূল আবহাওয়া, রুক্ষ প্রাকৃতিক পরিবেশ আর কষ্টকর বন্ধুর যাত্রাপথকে উপেক্ষা করে টানা ৭২ ঘন্টা পর্যন্ত একনাগাড়ে হাসিমুখে চিকিৎসা করে যাওয়া, তার পাশাপাশি সৈন্যদের আর গ্রামবাসীদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত শিক্ষা, ভয়াবহ প্লেগ মহামারীর প্রতিরোধ— ডাঃ কোটনিসের জীবনের সবচেয়ে উজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করল। এই ক্ষুদ্র সময়কালে অবশ্য এই অমানুষিক পরিশ্রম তার শরীরে ছাপ ফেলতে ছাড়েনি। ফলে মাত্র ৪ বছরের মধ্যে মারা গেলেন ডাঃ কোটনিস— ১৯৪২ সালের ৯ ডিসেম্বর মাত্র ৩২ বছর বয়সে— হ্যাঁ মানুষের মাঝেই, তাদেরই সেবারত অবস্থায়।

ডাঃ কোটনিস খুবই অল্প বছর বেঁচেছিলেন, মাত্র ৩২ বছর এবং তাঁর জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সময়কালও, সেরকমভাবে দেখতে গেলে, খুবই ছোট, মাত্র ৪-৫ বছর। অথচ ভাবতে অবাক লাগে এই ৪-৫ বছরের ঔজ্জ্বল্যের কাছে অনেক দীর্ঘায়ু এমনকী শতায়ু মানুষের সারাজীবনকে নেতাহই ম্লান, বিবর্ণ বলে মনে হয়।

মাদাম সান ইয়াৎ সেন বলেছিলেন— ''বর্তমানের চেয়ে ভবিষ্যত পৃথিবীতে ডাঃ কোটনিসের জন্য বেশী সম্মান অপেক্ষা করছে, কারণ এই ভবিষ্যত পৃথিবীর জন্যই ছিল ডাঃ কোটনিসের লড়াই।'' কথাটা মিথ্যে প্রমাণিত হয়নি। ভারত ও চীন দুই দেশই ডাঃ কোটনিসের সম্মানে ডাকটিকিট প্রকাশ করেছে। ডাঃ কোটনিসকে নিয়ে দু'দেশেই লেখা হয়েছে অনেক বই (যার মধ্যে খাজা আহমেদ আব্বাসের একটি বইয়ের নাম 'যে আর ফিরে আসেনি'), তৈরী হয়েছে সিনেমা (''ডাঃ কোটনিস কি অমর কাহানী'', ১৯৪৬, ভি শান্তারাম), চীনের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা এদেশে এলে নিয়ম করে তাঁর আদি বাড়িতে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করতে যান, কিন্তু বোধহয় এসব রাজকীয় সম্মান আর মর্যাদার মধ্যে নয়, ডাঃ কোটনিসকে সত্যিকারের সম্মান আর ভালোবাসা দেখানো হল তখন — যখন ২০০৫ সালে চীনে "Qinming" উৎসব চলার সময় (এটি একটি চীনা উৎসব যেখানে পূর্বপুরুষদের সম্মান জানানো হয়) হাজার হাজার মানুষ ডাঃ কোটনিসের সমাধিতে ফুল দিয়ে তার সমাধিক্ষেত্র পুরো ঢেকে দিল।

তাঁর এই নবীন সহযোগীর মৃত্যুতে মাও সে তুং বলেছিলেন— ''সৈন্যবাহিনী হারাল এক সহযোগী আর জাতি হারাল তার এক বন্ধুকে। আমরা যেন ডাঃ কোটনিসের আন্তর্জাতিকতা বোধের স্বপ্নকে বহন করে নিয়ে যেতে পারি।'' আজ, ডাঃ কোটনিসের জন্মশর্তবার্ষিকী বর্ষে এই আশাই প্রকাশ করা হচ্ছে।

○ শর্তসাপেক্ষ আর্থিক সহায়তা দিয়ে স্বাস্থ্যের উন্নতি ঃ খ্রীস্টান মেডিকেল কলেজ, ভেলোরের অধ্যাপক কে. এস. জেকব তথ্য প্রমাণ দিয়ে দেখিয়েছেন ধনতন্ত্রে ধনী দারিদ্রের মধ্যে দুরত্ব বৃদ্ধি, ব্যাপক খাদ্যাভাব, অনাহার, অপুষ্টি, কর্মহীনতা, স্বাস্থ্যের অভাবের মধ্যেও মাত্র ০.৫% জি. ডি. পি.-র নীচে খরচ করেও লাতিন আমেরিকার সমাজগণতন্ত্রী দেশগুলি দারিদ্র্য দূরীকরণে অনেক এগিয়েছে, স্বাস্থ্যেরও উন্নতি ঘটিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ তিনি আর্জেন্টিনার 'Universal Child Allowanance Programme, ব্রাজিল ও মেক্সিকোর শর্তসাপেক্ষ আর্থিক সহায়তা প্রকল্প বা Conditional Cash Transfer Scheme (CCTS), দক্ষিণ আফ্রিকার Child Support Grant, তাইল্যাণ্ডের Universal Health Care প্রভৃতি সফল প্রকল্পগুলির কথা বলেছেন। CCT-র উপর তিনি জোর দিয়েছেন। আমাদের দেশে CCT হিসাবে জননী সুরক্ষা যোজনা (JSY) অনেকটা সফল হয়েছে ও আরও সাফল্যের সম্ভাবনা আছে। অন্যদিকে ভুল প্রয়োগে Sterilization Programme মার খেয়েছে। এই CCTগুলি তখন ই ভালভাবে কাজে লাগানো যাবে যখন ভাল স্বাস্থ্য পরিষেবা গড়ে তোলা যাবে (NRHM-র মাধ্যমে অনেকটা সুযোগও এসেছে) এবং শিক্ষা, চেতনা, পুষ্টি ও সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা শক্তিশালী হবে।

○ দেবী শেঠীর প্রস্তাবনা ঃ ব্যাঙ্গালুরু কেন্দ্রিক নামী হৃদশল্যাবিদ ডা: দেবী শেঠি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা করে পশ্চিমবঙ্গে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতির জন্য একগুচ্ছ প্রস্তাব দিয়েছেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলি হল: (১) প্রতিটি জেলায় অন্তত ১৫টি টারসিয়ারি হাসপাতাল গড়ে তোলা যেগুলিতে যাবতীয় রোগ নির্ণয় ব্যবস্থা এবং ডায়ালিসিস ও ক্যাথ ল্যাবের ব্যবস্থা থাকবে। (২) চার লক্ষ শিক্ষক সহ নাগরিকদের স্বাস্থ্যবীমার ব্যবস্থা এবং পুলিশ কর্মীদের জন্য 'ক্যাশলেস' চিকিৎসা বীমার সুযোগ দান, (৩) রাজ্যে নতুন ২৫টি মেডিকেল ও নার্সিং কলেজ গড়ে তোলা। এখন দেখার বিষয় এগুলি কারা কিভাবে কতদিনের মধ্যে করবে? চিকিৎসার খরচ কেমন হবে? সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে থাকবে কি, না শহুরে হাসপাতালের 'ঘটি বাটি বিক্রি'র ব্যবস্থা গ্রামেও ঢুকে পড়বে? বীমা থাকলে সতি সত্যিই কি পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা পাওয়া যাবে? লক্ষ লক্ষ মানুষের থেকে সংগৃহীত কিস্তির বিপুল টাকা কোথায় যাবে? ২৫টি মেডিকেল কলেজের শিক্ষাও চিকিৎসার গুণমান কি বজায় থাকবে? সেখান থেকে স্নাতক হওয়ার পর ডাক্তার ও নার্সরা কি করবে?

ডা: সুজিত কুমার দাস

— সম্পাদকমণ্ডলী

প্রায় ৭৪ বছর বয়সে চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ অকৃতদার ডা: সুজিত কুমার দাশ সকলকে ছেড়ে চলে গেলেন। দিয়ে গেলেন তাঁর দেহকে, চিকিৎসা শিক্ষার কাজে, কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ছাত্রদের জন্য। এবং অবশ্যই ৪০ বছরেও বেশী তাঁর জীবনের ঘটনাবহুল বিষয়গুলিকে।

পেশায় স্বনামধন্য হয়েও তিনি পেশার গ্রাসে আবদ্ধ হননি। চিকিৎসার পণ্যায়নের বিরুদ্ধে সরব ছিলেন আমৃত্যু। সরকারী চিকিৎসকদের সংগঠন তৈরী এবং বিভিন্ন দাবীর আন্দোলন করতে গিয়ে ৭০ এর দশকে বারবার রাজরোষে পড়তে হয়েছে তাঁকে। কিন্তু কখনও মাথা নত করেননি। বর্তমানে সরকারী চিকিৎসকরা যে সকল সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকেন তার অন্যতম সূচনাকারী ছিলেন ডা: দাশ।

১৯৮৪ সালের ভূপাল গ্যাস কাণ্ডের কথা সবারই জানা। ''No More Bhopal Committee'' তৈরীর কলকাতায় তিনি ছিলেন প্রধান সংগঠক। পরে সুপ্রীম কোর্ট নিয়োজিত বিশেষজ্ঞ কমিটির দু-জন বেসরকারী বিশেষজ্ঞের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম।

''Drug Action Forum'', সংগঠনটি অন্যদের নিয়ে ১৯৮৬ সালে তিনি গড়েছিলেন একটি বিশেষ দর্শন থেকেই, ''মানুষের জন্য ওষুধ না ওষুধের জন্য মানুষ''— কোনটা ঠিক! এবং নিয়মিত পত্রিকাও ইংরাজীতে প্রকাশ করেন, — ''Drug, Disease, Doctor''। ঐ সংগঠন এবং তার মুখপত্র সারা ভারতবর্ষে অপচিকিৎসা ও অপবিজ্ঞানের বিরুদ্ধে লড়াইতে মানুষের অন্যতম হাতিয়ার বলে পরিগণিত হয়। এবং এইসব কিছুরই প্রাণ পুরুষ ছিলেন ডা: সুজিত কুমার দাশ।

বর্তমান সময়ে যখন সাম্যবাদের আদর্শ পদাহত, সুজিত দাশ কমিউনিষ্ট আন্দোলনের সংকট ও সমাধানের অনুসন্ধানে ১৯৯১ সালে একটি বই প্রকাশ করেন ''কমিউনিজম্ ও গণতন্ত্র''। তাঁর মতে — ''কমিউনিজম্ ও গণতন্ত্র নিয়ে পূণর্বিচারে তদারিকটা জরুরী হয়ে পড়েছে। গলদটা কোথায় তার অনুসন্ধান আবশ্যিক হয়ে পড়েছে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে গোঁড়া কমিউনিস্টরা জীবনে কোনদিন খোলা মনে আত্ম-সমালোচনা করে নি। আজ সংকটের মুখোমুখি হয়ে তা করতে আরো ভয় পাচ্ছে। নেতারা আরো বিচলিত, কারণ আত্মসমালোচনা করলে নেতৃত্ব হারাবার ভয় আছে। অথচ পরিবর্তনের প্রবল বেগ কাউকে খাতির করছে না, করার কথাও নয়। এই পরিবর্তনের চরিত্র ও গতি বুঝতে হলে খোলামনের আলোচনা ছাড়া আর কোন পথ নেই; পুরানো ফরমূলাগুলি অকেজো হয়ে পড়েছে।''

ডা: সুজিত কুমার দাশ কে স্মরণ করতে গিয়ে তাঁর আরো বহু বিষয় মনে পড়ে যায়। ডা: বিনায়ক সেন যখন ২০০৯ সালে কলকাতায় একটি স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠানে আসেন তখন ডা: দাশকে এ বিষয়ে জানালে তাঁর অসুস্থ শরীরের কথা এড়িয়ে গিয়ে বলেন, ''হ্যাঁ আমি কিন্তু ওখানে শুনতে যাবো, কিছু বলার জন্য অনুরোধ যেন না আসে।'' স্পষ্ট কথা তিনি অকপটেই বলতেন। এবং কোন তোষামোদই বোধহয় কেউ তাঁর মধ্যে দেখেন নি।

শ্রী হরিপদ দাস

— সম্পাদকমণ্ডলী

শ্রী হরিপদ দাশ : প্রায় ৮০ বছর আগে অধুনা বাংলাদেশের পদ্মাপাড়ে হরিপদ বাবুর জন্ম। কর্মস্থল পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থান। স্বাস্থ্য বিভাগের সাধারণ স্বাস্থ্যকর্মীর পদ মর্যাদা থেকে 'বড়বাবু'র পদে উন্নতি। এটা তাঁর সাধারণ পরিচয়। তিঁনি আজ আমাদের সকলের স্মরণীয় হলেন কিভাবে, সে কথাতেই আসছি।

স্বাস্থ্যকর্মী বা 'বড়বাবু' যে পদেই যখন ছিলেন, তিনি তাঁর সহকর্মী চেনাজনের সমস্যার কথা শুনেছেন এবং সমাধানের চেষ্টা করেছেন। এভাবেই তিঁনি রাজ্যসরকারী কর্মচারী সংগঠনের সাথে নিজেকে প্রবলভাবে যুক্ত করেন। এবং একই সঙ্গে সংগঠনের গণ চরিত্র বজায় রাখার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর ক্ষুদ্র স্বার্থ চরিতার্থের কোন সুযোগও দেননি। একাজের জন্য তাঁকে অনেক কঠিন সমস্যার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে। ৭০-এর দশকে পশ্চিমবাংলার রাজনৈতিক অস্থিরতার সময়ে তাঁকে বহু ধরণের জটিল প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে এগোতে হয়। কিন্তু অসম সাহসী হরিপদবাবু ভয়ে হাতগুটিয়ে বসে থাকেন নি। ঐ দুর্দিনেও তিনি সাধারণ মানুষের কথাই ভেবেছেন, ব্যক্তিগত স্বার্থকে বড় করে দেখেননি।

চাকরী থেকে অবসর নেওয়ার পরে সাধারণত: মানুষ যখন আয়েস করতে চান, হরিবাবু কিন্তু বিপরীত পথে পা বাড়ালেন। বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন, মানবাধিকার সংগঠন, জনস্বাস্থ্য আন্দোলন গড়ে তোলার সংগঠন, গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত মানুষদের জন্য নতুন ধরণের সংগঠন গড়ার কাজ শুরু করেন তাঁর জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর এবং অন্য জেলাতেও। প্রায় ৮০ বছর বয়সেও তিনি সুদুর মেদিনীপুর শহর থেকে কোলকাতার ঘনঘন যাতায়াত করতেন সাধারণ মানুষের সংগঠনের স্বার্থে। সমস্যা দেখে সমাধানের উদ্দেশ্যে তিনি সক্রিয় হতেন এবং কখনোই কোন রঙ দেখে নয়।

রবিবার, ১৭ই এপ্রিল ২০১১, তাঁর জীবনের শেষে ভোরের আলোতেও তিনি ব্যস্তভাবে প্রাতকৃত্য সেরে তৈরী হতে চেয়েছিলেন ঐ দিনের প্রথম বাসটি ধরে মেদিনীপুর শহর থেকে বেলপাহাড়ী গিয়ে বঞ্চিত ও মেহনতী মানুষকে সংগঠিত করতে। তিনি সেখানে যেতে পারেন নি কিন্তু তাঁর গুণমুগ্ধ মানুষজন ঐ ৮০ বছরের তরুণপ্রাণ মানুষটিকে তাঁর শেষ যাত্রায় শুধু চোখের জলে নয় বরং নতুন পৃথিবী গড়ার সংকল্প গ্রহণের মধ্যে স্মরণ করেছেন।

''হরিবাবু'' দের মৃত্যু, নতুন প্রাণের জন্ম দেয়। অমর হয়ে থাকেন আগামী দিনের স্বপ্ন সন্ধানীর মধ্যে — যাঁরা শপথ নিচ্ছেন - যেখানে উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল'' নেই এমন এক ধরীত্রি গড়ার। শ্রী হরিপদ দাস অমর রহে ।।

Obituary 1

Dr. Granado passes away

– Comp : Arani Sen

Alberto Granado, who accompanied Ernesto 'Che' Guevara on a 1952 transcontinental journey of discovery across Latin America that was immortalized in Guevara's memoir and on-screen in "The Motor Cycle Diaries", died in Cuba on 5.03.' 11.

Granado and Guevaras' road trip, begun on a broken down motor cycle they dubbed La Poderosa (The Powerful) awoke in Guevara a social consciousness and political convictions that would help turn him into one of the most iconic revolutionary of the 20th century.

In our school days when we read 'Che Guevara's Diary', translated by 'Padatik' poet Suvash Mukhopadhaya, our hairs became straight. Later we read different books on Che as well as his writings. Here we must mention one excellent translation of Che's memoir with photos, 'Cholte Che,' published by Riti Prakashani. We became spelbound finding the high level of thinking, quest and convictions at their early medicos lives and their planning and organization of such a brave, difficult, long, adventurous and romantic voyage.

Also another great film on their journey is "The motor Cycle Diaries" produced byRobert Redford and directed by Walter Sallas of Chile. The film is not only an authenticated documentation of the famous journey but it also vividly depicts the mental transformation of Che and Granado toward underprivileged. Witnessing deep poverty and oppression across the continent– Chile to Colombia, particularly the mine workers and leper patients of Peru they changed their future aims of lives. Cinematographically the film is also superb and brings us to the wonderful nature and beautiful lives of Latin America, The La Plata, The Pampas, The Patagonia, The Pacific Coast, The Andes, The forests of upper stream Amazon etc.

After the journey Granado stayed at a leper clinic in Venezuela and Che went up to Miami, US, returned to Buenos Aires to finish his medical course and then dedicated himself for revolutions in Latin America and Africa. After Cuban revolution at Che's invitation Granedo visited Cuba and spent a low profile life there teaching Bio Chemistry in Havana University.